

## Innovation

### বিদআত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কেউ যদি ইসলাম নিয়ে ভালভাবে পড়াশোনা করে আর বাংলাদেশের প্রধান পালিত ধর্মের সাথে মিলিয়ে দেখে তাহলে ভাবাচাচাকা খেয়ে যাবে - বুঝতেই পারবেনা যে বাংলাদেশের মানুষ আসলে মানে কী? আর কেউ যদি ইসলামের বাংলাদেশ ভাষন মানতে মানতে আসল ইসলামের সাথে পরিচয় হয় তখন কুল রাখাই দায় হয়ে যাবে, মানবো কোনটা? বাপ-দাদার সামাজিক ইসলাম নাকি আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) যেই ইসলাম দিয়েছেন সেই ইসলাম? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন বাঙালি নাকি ধর্মের খাঁচা নিয়ে উদ্বল নৃত্য করে; পাখিটা যে উড়ে গেছে তার কোন খেয়াল রাখে না। কিন্তু সত্যটা হল আমাদের হাতে যে ভাঙাচোরা খাঁচাটি আছে তা আসলে পাখির খাঁচাই না। ইসলামের বুননটি এমনি যে খাঁচা ঠিক থাকলে পাখি তাতে থাকতে বাধ্য। যারা পাখির খোঁজে দেশ-বিদেশের তাত্ত্বিকদের কাছে ধর্মা দিচ্ছেন তারা ইসলাম চেনেননি। আচ্ছা, ইসলাম কি কোন ধর্ম? আদতে ইসলাম কিন্তু কোন ধর্ম নয়, কোন 'বাদ' বা 'ইজম' নয়, কোন আদর্শ বা আইডিওলজির নাম নয়। বরং এটি একটি 'দ্বীন' বা জীবন ব্যবস্থা যার মূল ভিত্তি তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ)। একজন মানুষ যখন তার বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে আল্লাহকে তার 'রব্ব' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক এবং প্রভু হিসেবে চিনতে পারে তখন সে নিঃশর্তভাবে আল্লাহকে একমাত্র 'ইলাহ'- উপাস্য হিসেবে মেনে নেয়। তখন সে আল্লাহর আদেশ এবং নিষেধ এ দুইয়ের কাছেই করে আত্মসমর্পণ। আর এই আত্মসমর্পণকেই বলা হয় ইসলাম।

একজন মুসলিম প্রতিদিন যে কাজই করে তাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

১. মু'আমালাত বা জীবন যাপনের সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজ- যেমন: উপার্জন করা, ঘুমানো, বাজারে যাওয়া, বিনোদন ইত্যাদি।
২. ইবাদাত বা আল্লাহর দাসত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত কাজ- যেমন: সালাত (নামায), যাকাত, সিয়াম (রোজা), হাজ্জ, কুরবানি, বিচার করা ইত্যাদি।

এখন মু'আমালাতের ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে নিষেধ আর ইবাদাতের ক্ষেত্রে মেনে চলতে হবে আদেশ। এই মূলনীতি এসেছে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে-

'রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও'। (সূরা হাশর: ৭)

মু'আমালাতের ব্যাপারে মূলনীতি হল যা নিষেধ করা হয়েছে তা ছাড়া বাকি সবই করা যাবে। উপার্জন করার ব্যাপারটা ধরা যাক। এক্ষেত্রে আল্লাহ তার রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে কিছু জিনিস সুস্পষ্টভাবে হারাম বা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। এই নিষিদ্ধ জিনিসগুলোর সংশ্লিষ্টতা না থাকলে সবকিছুই হালাল বা অনুমোদিত। যেমন সিগারেট ইসলামে হারাম। এখন একজন মুসলিম চাষীর জন্য তামাক গাছ চাষ করা নিষিদ্ধ। একজন মুসলিম ব্যবসায়ীর জন্য সিগারেটের ব্যবসা নিষিদ্ধ। একজন মুসলিম বিজনেস এজেন্টের জন্য ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকোতে চাকরি করা নিষিদ্ধ। একজন মানুষ যখন নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করবে তখন তার কর্তব্য হবে ইসলামে হারাম যে কোন জিনিস থেকে নিজের উপার্জনকে মুক্ত রাখা।

যারা তর্ক শুরু করে এবং বলে 'ইসলাম ১৪০০ বছর আগের ধর্ম' - তারা আসলে বোঝেইনি ইসলাম কী? ১৪০০ বছর আগের কথা বাদই দেই - ৫০ বছর পূর্বেও সিডি বলে কিছু ছিল না, আজ আছে। এর ব্যবসা করা যাবে কি? ইসলামের মূলনীতি বলে - পর্ন সিডি (অশ্লীল ভিডিও), মিউজিক (গান), পাইরেটেড সফটওয়্যার সহ আর যা কিছু হারাম আছে সেগুলো বাদ দিয়ে সিডির ব্যবসা করাতে সমস্যা নেই। অথচ হুব-সেক্যুলার ডিজিটাল বাংলাদেশের আইটি নীতিমালাই এখনো চূড়ান্ত হয়নি! বিজ্ঞানের বদৌলতে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে বহু কিছু নতুন আসবে। সেক্ষেত্রে আমরা হারামের নীতিমালা মেনে, সেগুলো বাদ দিয়ে বাকি সবকিছু গ্রহণ করতে পারবো।

রাসূল (সাঃ) -এর যুগে মানুষ উটে চড়ত, ভাসতো জাহাজে। এখন মানুষ প্লেনে চড়ে, গাড়িতে চড়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করে। এতে কোন সমস্যা নেই। কারণ আকাশে উড়া যাবে না বা দ্রুত চলা যাবে না এমন কোন নিষেধ আমরা কুরআন এবং সহীহ সুন্নাহ (হাদিস) থেকে পাই না। বর্তমান সভ্যতার যে সুবিধাগুলো আমাদের জীবনে ভোগ করছি তা আল্লাহর দেয়া অনুগ্রহ এবং পরিমিতভাবে তার সুব্যবহারে কোন নিষেধ নেই।

এবার ইবাদাতের ব্যাপারে আসা যাক। ইবাদাতের ব্যাপারে মূলনীতি হল যা করতে আদেশ করা হয়েছে শুধুমাত্র তা করা, তা ছাড়া বাকি সব কিছুই নিষিদ্ধ। কোন ইবাদাত যত ভাল লাগুক না কেন তার পক্ষে যদি কুরআন এবং সহীহ হাদিস থেকে কোন প্রমাণ না পাওয়া যায় তবে সেটা করা নিষিদ্ধ। কেউ যদি এমন কোন কাজ করে তবে সেটা হবে 'বিদআত'।

ইসলামি পরিভাষায় বিদআত হল আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে নতুন করে এমন কোন প্রথা চালু করা বা এমন কোন রেওয়াজ চালু অথবা প্রচলন করা হয়েছে যার পক্ষে শরীয়তের কোন সাধারণ কিংবা সুনির্দিষ্ট দলীল/প্রমাণ নেই। দলীল/প্রমাণ বলতে আল কুরআন এবং সহীহ হাদিসকে বুঝায়। যঈফ বা দুর্বল হাদিস যেহেতু নিশ্চিতভাবে রাসূলের (সাঃ) থেকে এসেছে তা প্রমাণ করা যায় না সেহেতু তা দিয়ে কোন বিধানও জারি করা যায় না। আর জাল হাদিস তো একেবারেই বাতিল। যদিও আমাদের দেশে প্রচুর জাল ও দুর্বল (যঈফ) হাদিস প্রচলিত আছে। তবে আল্লাহর মেহেরবানীতে বর্তমানে জাল ও যঈফ হাদিসগুলোকে আলাদা করা হয়েছে।

বিদআত পাপের তালিকায় অনেক বড় পাপ, শিরকের পরেই এর স্থান। এর কারণ বিদআত করা মানে আল্লাহকে খুশি করতে এমন কিছু করা যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) করেননি অথবা করতেও বলেননি। এবং রাসূলের (সাঃ) সাহাবী, তাবঈন, তাব-তাবঈন এমনকি চার ইমাম পর্যন্তও কেউ করেননি। আমি/আমরা যখন বিদআত করি তখন সেটার দু'টো মানে দাড়ায়-

১. মুহাম্মদ (সাঃ) রাসূল হিসেবে তাঁর দায়িত্ব ঠিকমত পালন করে যাননি। আমি/আমরা যে কাজটি (বিদআতটি) করছি সেটা একটা ভালো কাজ অথচ এই ভালো কাজটির কথা আমাকে/আমাদেরকে রাসূল (সাঃ) বলে যাননি।
২. আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর চাইতে বেশি ভাল মানুষ, কারণ আমি আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে এমন সব ভাল কাজ করছি যা তিনি [রাসূলুল্লাহ (সাঃ)] করেননি।

এ দু'টিই আমরা যে কালিমা পড়ে মুসলিম হই তার বিরুদ্ধে যায়। কারণ 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' কথাটি বলার মাধ্যমে আমরা এই সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ মানুষ জাতির মধ্যে সবচেয়ে ভাল মানুষটিকে বেছে নিয়ে তাকে শেষ রাসূল করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। আর আল্লাহর কাছ থেকে যা কিছু এসেছে তিনি [রাসূল (সাঃ)] তার সবকিছু মানুষের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দিয়ে তাঁর দায়িত্ব চমৎকারভাবে পালন করেছেন।

শুধু তাই নয় বিদআত কুরআনের আয়াতের বিরোধিতা পর্যন্ত করে। আল্লাহ তাআলা বিদায় হাজ্জের দিন নাযিল করেছিলেন-

“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে”। (সূরা মায়িদা: ৩)

এই আয়াতের মানে আল্লাহ তার রাসূলের জীবদ্দশাতেই কি করতে হবে আর কি করা যাবে না তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। যখন কেউ বিদআত করছে তখন সে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ করে দেয়া দ্বীনে কিছু যোগ করছে বা বদলে দিচ্ছে। আল্লাহর উপর খবরদারী (মাতুব্বরী) করার নিকটতম উদাহরণ এটি। পূর্ণাঙ্গ মানে পরিপূর্ণ; এতে যোগ-বিয়োগ বা পরিবর্তন করার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া মানুষের ইচ্ছামত যদি শরীয়ত প্রবর্তন করা জায়েয হয়, তাহলে অর্থ এই হয় যে, নবী (সাঃ) -এর জীবদ্দশায় ইসলাম পরিপূর্ণ হয়নি। কোন বিদআত প্রবর্তন করে তাকে হাসানাহ বা উত্তম বলে ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা নাবী (সাঃ) বলেন, “প্রতিটি বিদআতই গোমরাহী।”

ইমাম শাত্তুবী (রাহঃ) বিদাতীর ১৭টা ভয়াবহ পরিণাম উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে প্রথমটি হল যে বিদাতীর ফরয বা নফল কোন ইবাদাতই কবুল হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাওবা করে ঐ বিদআত না ছেড়ে দিচ্ছে! এত কষ্ট করে সালাত (নামায), রোযা, হাজ্জ, যাকাত সবই আল্লাহর কাছে অগ্রহণযোগ্য হবে কারণ সে বিদাতে লিপ্ত আছে। শুধু তাইনা বিদআত করার কারণে তার উপর আল্লাহ, সকল ফেরেশতা এবং মানুষের অভিশাপ নেমে আসে।<sup>১</sup>

সাধারণ একজন মানুষ একটা পাপ করে অনুতপ্ত হয়, তার খারাপ লাগে, সে আল্লাহর কাছে মাফ চায়। কিন্তু যে বিদআত করছে সে ভাবে সে খুব ভাল কাজ করছে আর তাই তার খারাপও লাগে না আর সে কখনো ক্ষমাও চায় না। শুধু তাইনা, একজন বিদাতী তার কাজের সাথে একমত না হওয়ায় সুন্নাতের অনুসরণকারীদের ঘৃণা করে। আমরা যে আজ এত ভাগে বিভক্ত তার মূল কারণ সুন্নাত ছেড়ে দেয়া আর বিদআতে জড়িয়ে পড়া।

বিদআত সুন্নাতের শত্রু। এক গ্লাস ভর্তি পানির মধ্যে যদি কোন জিনিস ফেলা হয় তখন সেই জিনিসটাকে জায়গা করে দিতে গিয়ে কিছুটা পানি পড়ে যায়। ঠিক তেমনি যখন কোন বিদআত চালু হয় তখন সেখানকার সুন্নাত সরে যায়। এক্ষেত্রে একটি হাদীস: হযরত হাসসান ইবনে সাবেম (রা) বলেন, “যখনই কোন কাওম (জাতি) দ্বীন সম্পর্কে কোন বিদআত সৃষ্টি (চালু) করেছে, তখনই আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্য থেকে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নিয়েছেন। অতপর কিয়ামত পর্যন্ত এটা আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেবেন না”। - (দারেমী)। আমাদের দেশে ফরজ সালাতের পর হাত তুলে গণ মুনাযাত করা হয়। এর ফলে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সালাম ফেরানোর পর যে দু'আ গুলো পড়তেন সেগুলো পড়ার আর সুযোগ থাকে না। কারণ জনগণ তখন ইমামের নাকি কান্নার সাথে আমিন আমিন বলতে ব্যস্ত থাকে।

বিদআত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উপদেশের সারমর্ম হল:

নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মদের আদর্শ। আমার পর তোমাদের মধ্যে যে জীবিত থাকবে সে বহু মতবিরোধ দেখতে পাবে, এমতাবস্থায় তোমরা অবশ্যই আমার ও হিদায়াত প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুনাত অবলম্বন করবে। আর তা অত্যন্ত মজবুতভাবে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে, ধীনের ব্যাপারে নতুন আবিষ্কার থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। কারণ, নব উদ্ভাবিত প্রত্যেক বিষয়ই বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআত হল পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম (দোযখ)।<sup>২</sup>

বিদআত থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের যা করতে হবে তা হল সুনাত সম্পর্কে অর্থাৎ সহীহ হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা। কোন্ কাজ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিভাবে করতেন সেটা কুরআন এবং সহীহ হাদিস থেকে দলীল (প্রমাণ) সহ আমাদের জেনে নিতে হবে। দলীল (প্রমাণ) ছাড়া কোন কথা/কাজ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা তার মহাশুখ আল-কুরআনে বলেন, “আর কতক মানুষ এমনও আছে যারা আল্লাহ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছাড়া, কোন প্রমাণ (দলীল) ছাড়া ও কোন উজ্জ্বল কিতাব (কুরআন ও সহীহ হাদিস) ছাড়াই বিতর্ক করে; সে অহংকারে ঘাড় বাঁকিয়ে বিতর্ক করে, যাতে সে লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে। ...” (২২: ৮, ৯)। কাজেই কুরআন ও সুনাতের দলীল জীবনের প্রত্যেক স্তরে প্রয়োগ করতে হবে। সালাত (নামাজ) কিভাবে পড়ব এটা যেমন রাসূলের (সাঃ) সহীহ হাদিস থেকে শিখে নিব ঠিক তেমনি মানুষ মারা গেলে কি করতে হবে তাও আল্লাহর রাসূল (সাঃ) থেকেই শিখতে হবে।

কেউ যদি কোন ইবাদাত করতে বলে তবে যেই ইবাদাত সে করতে বলবে তার সপক্ষে তাকে প্রমাণ দেখাতে হবে। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি বলে, “আসরের সালাত ৪ রাকাত, ইশার সালাত ৪ রাকাত, মাগরিব ৩ রাকাত কেন? সালাত পড়া তো ভাল কাজ। ১ রাকাত বেশি পড়লে সমস্যা কি? মাগরিব ১ রাকাত কম পড়ব কেন? রাসূল কোথায় নিষেধ করেছেন যে মাগরিবের সালাত ৪ রাকাত পড়া যাবে না?”

যেহেতু রাসূল (সাঃ) ৩ রাকাতই পড়েছেন তাই ৩ -এর অতিরিক্ত সব সংখ্যাই বাদ। কোনটা করা যাবে না সেটার তালিকা হবে অসীম। তাই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) যা করেছেন সেটা বাদে বাকি সব বাতিল। এর দলীল (প্রমাণ)- “যে কেউ একটি ভাল কাজ করল যা করার আদেশ আমি দেইনি তা প্রত্যাখ্যাত এবং গ্রহণযোগ্য নয়।” আমাদের ধীনে নতুন কিছু সংযোজন ও সৃষ্টি (চালু) করবে যা মূলত তাতে নেই সেটি পরিত্যাজ্য।<sup>৩</sup>

অনেকে বিদআতের বিরুদ্ধে কথা তুললেই বলেন তাহলে তো মাইক ব্যবহারও বিদআত- এটাতো নতুন আবিষ্কার। মাইক দিয়ে আযান দিলে বেশি সাওয়াব হবে এ জন্য কেউ মাইকে আযান দেয় না, দেয় যাতে করে বেশি মানুষ আযান শুনতে পায় সেজন্য। একই কারণে রাসূলের যুগে গলার স্বর উঁচু করে আযান দেয়া হত।

বিদআত নিয়ে সন্দেহ থাকে অনেকেই, ভাবে শবে বরাতের ইবাদাতের কোন সহীহ হাদিস নেই তো কি হয়েছে, দুর্বল হাদিস তো আছে। ঐ রাতে অনেক সালাত পড়লাম, শবে বরাত সত্যি হলে তো সাওয়াব পেলামই- আর না থাকলেও ক্ষতি কি? সালাতের সাওয়াব তো পাব।

এ কথা প্রত্যেককেই মনে রাখতে হবে ইসলামে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। যা করতে হবে সবকিছু নিশ্চিত হয়ে। কারণ রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “হালাল স্পষ্ট, হারাম স্পষ্ট এবং এর মাঝে কিছু সন্দেহের বস্তু আছে যার ব্যাপারে অনেকেই জানে না/অবগত নয়। যে এসব সন্দেহের বিষয়গুলো এড়িয়ে চলল সে নিজের ধীন এবং সম্মানকে রক্ষা করল। কিন্তু যে সন্দেহের বিষয়ে জড়িয়ে গেল সে (যেন) হারামে জড়িয়ে গেল।”<sup>৪</sup>

একজন প্রতি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে, সে ১৫ই শাবানের রাতেও সালাত পড়বে- তাতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যদি কেউ এ রাতে সালাতের বিশেষ কোন মর্যাদা আছে সেজন্য সালাত পড়ে তবে সে বিদআত করল। এ রকম ভুরি ভুরি উদাহরণ দেয়া যাবে। যেমন: সালাতের সময় রাসূল (সাঃ) -এর মাথায় কাপড় থাকতো। কিন্তু মাথায় টুপি/পাগড়ি দিলে সাওয়াব বেশি হয় এমনটা ভাবা বিদআত। কারণ এর প্রমাণে কোন সহীহ হাদিস নেই।

নিশ্চিত দলীল (প্রমাণ) ছাড়া আমল করাই যাবে না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ‘ইয়াওমুশ শাক্ক’। শাবান মাসের ২৯ তারিখে যদি আকাশে মেঘের জন্য চাঁদ না দেখা যায় তবে পরের দিনকে বলে ‘ইয়াওমুশ শাক্ক’ বা সন্দেহের দিন। কারণ এটি রমযানের ১ তারিখ হতে পারে আবার শাবানের ৩০ তারিখও হতে পারে। তাই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এ দিন রোযা থাকতে নিষেধ করেছেন এবং শাবান মাসের ৩০ দিন পুরো করতে বলেছেন। অনিশ্চিত অবস্থায় সেফ সাইডে থাকতে গিয়ে একদিন আগে রোযা রাখাকেই হারাম করা হয়েছে।<sup>৫</sup>

২। মুসলিম, আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকিম নাসায়ী। (মিলিত)

৩। বুখারি- খন্ড: ৯, পৃষ্ঠা: ৩২৯

৪। মুসলিম: ৩২৪৩

৫। বুখারি: ৫২, মুসলিম: ১৫৯৯।

৬। আত তিরমিযি: ৬৮৬, আন-নাসায়ী: ২১৮৮।

নিচের আয়াতটি বিদাতীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যা ইমাম ইবনু কাসির তার তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

“আপনি বলে দিন: আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের পরিচয় দেব যারা আমলের দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত? তারা এইসব লোক, এ দুনিয়ার জীবনে যাদের পরিশ্রম বিফল হয়েছে, অথচ তারা মনে করে যে, তারা উত্তম কাজ করেছে।”  
(সূরা কাহ্ফ: আয়াত- ১০৩, ১০৪)

আমাদেরকে বুঝতে হবে সিরাতাল মুস্তাকিম একটাই, আর সেটা হল রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং তার সাহাবীদের পথ। এ ছাড়া অন্য যে পথেই মানুষ যাবে সে পথ যত সুন্দর মনে হোক না কেন বা যত কষ্টের হোক না কেন সেটা আল্লাহ্ থেকে শুধু দূরেই নিয়ে যাবে।

আল্লাহ্ আমাদের বিদআত থেকে বেঁচে রাসূলের (সাঃ) সুনাত মেনে চলার মানসিকতা ও সামর্থ্য দিন। আমিন।

উপরোক্ত বিদআত সম্পর্কিত লেখাটি পড়ার পর আশাকরি আপনি আমাদের সমাজের/রাষ্ট্রের বিদআত গুলোকে চিহ্নিত করতে পারবেন এবং বিদআত থেকে বেঁচে থাকতে সর্বদা সচেষ্ট হবেন। এবং সেই সাথে আপনার পরিবারকেও বিদআত বেঁচে থাকার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। আমাদের সমাজে প্রচলিত কতিপয় বড় ধরনের বিদআত গুলো নিম্নে তুলে ধরা হল:

১. “মীলাদ মাহ্ফিলের” অনুষ্ঠান করা।
২. “শবে-বরাত” পালন করা।
৩. “শবে-মেরাজ” পালন করা।
৪. “জন্মদিন” ও “বিবাহ বার্ষিকী” পালন করা।
৫. “১লা বৈশাখ” নামে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির চর্চা করা।
৬. “বিশ্ব ভালবাসা” দিবস পালন করা।
৭. “ইংরেজী নববর্ষ” উদযাপন করা।
৮. মৃত ব্যক্তির কায়া বা ছুটে যাওয়া নামায সমূহের কাফফারা আদায় করা।
৯. মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির জন্য ৭ম, ১০ম অথবা ৪০তম দিনে খাওয়া ও দু’আর অনুষ্ঠান করা।
১০. ইছালে ছাওয়াব বা ছাওয়াব রেসানী বা ছাওয়াব বখশে দেওয়ার অনুষ্ঠান করা।
১১. মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাতের জন্য অথবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে খতমে কুরআন অথবা খতমে জালালীর অথবা জিফদ অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি।
১২. রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর জন্মদিন/মৃত্যুদিন পালন করা।
১৩. আশুরার দিবস পালন করা এবং ইমাম হাসান, হোসাইন -এর জন্য মাতম করা।
১৪. জোরে জোরে চিল্লিয়ে জিকির করা।
১৫. হালকায়ে জিকিরের অনুষ্ঠান করা।
১৬. “পীর সাহেবের” কাছে মুরীদ হওয়া এবং “উরস” পালন করা।
১৭. ফরয, সুনাত ও নফল তথা বিভিন্ন ধরনের নামায শুরুর করার পূর্বে মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যাত পড়া।
১৮. পেশাব করার পরে পানি থাকা সত্ত্বেও অধিকতর পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে টিলা/কুলুখ নিয়ে ২০, ৪০ কদম হাটাহাটি করা, জোরে জোরে কাশী দেওয়া, হেলা-দুলা করা, পায়ে-পায়ে কাচি দেয়া এসবই বেহায়াপনা কাজ ও পরিষ্কার বিদআত।
১৯. বিশ্ব ইজতেমা -কে গরীবের হজ্জ মনে করা এবং হজ্জের সমান সওয়াব হবে বলে বিশ্বাস পোষন করা।

উপরে উল্লেখিত বিদআত ছাড়াও আরও অনেক বিদআত আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে ঢুকে পড়েছে শুধুমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা না থাকার কারণে। আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করি আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত কুরআন ও সুনাহর (অর্থাৎ সহীহ হাদিসের) মানদণ্ডে সবকিছুকে বিচার-বিশ্লেষণ করে যাচাই করা নেয়া যাতে করে আমরা বিভ্রান্তি থেকে বেঁচে থেকে সত্যিকারের আল্লাহর সন্তুষ্টি ও কল্যাণ লাভ করতে পারি। কত বড় বড় খ্যাতিমান আলেম/পীর সাহেব কি বলল অথবা এত লোক যা করছে তারা কি সবাই ভুল করছে এসব খোড়া যুক্তি বা অজুহাত যেন আমরা পেশ না করি। আল্লাহ্ যেন আমাদের সবাইকে কুরআন ও সহীহ হাদিসের সঠিক বুঝ/জ্ঞান দান করেন।। আমীন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: যারা বিদআতের ব্যাপারে আরো বিশদ জানতে চান তারা ড. মুহাম্মদ মানজুরে ইলাহী লিখিত **‘বিদআত চেনার মূলনীতি’** বইটি পড়তে পারেন।